

১৭ এপ্রিল ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাবার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি কিছু বলবার আগে প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংবাদপত্রসেবী এবং নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিদেরকে যে, তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে এবং তার সেই দস্যু বাহিনী বিদেশী সাংবাদিকদের ভেতরে আসতে দেয়নি, যারা ভেতরে ছিলেন তাদেরও জবরদস্তি করে ২৫ তারিখ রাতেই বের করে দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই যাতে ব্যাহত না হয় এবং কোন অবস্থাতেই সেই সংগ্রামকে ভুল ব্যাখ্যা না দেয়া হয় সেজন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষ থেকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে, আবেদন জানাবো ভবিষ্যতেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন যাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয়, যাতে কোনো দুষ্টকারি বা কোন শত্রু বা এজেন্ট ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে, ভুল বোঝাতে না পারে। সেই সাথে আমি আপনাদেরকে আরও অনুরোধ জানাবো আমাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে হ্যান্ড আউট যাবে সেটাকেই বাংলাদেশ সরকারের সঠিক ভাষ্য বলে ধরে নেবেন, সেটাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নিবেন। আর আমি আপনাদেরকে আরও একটি অনুরোধ জানাবো জানিনা কিভাবে সেটা সম্ভব হবে, আমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে আপনারা কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন, কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজেঁ করতে পারেন সেই ব্যাপার আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমরা অত্যন্ত সাদরে, আনন্দের সাথে গ্রহণ করব। এখন আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভাষ্য তুলে ধরব।

“বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ও ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের গণ-হত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে কিভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তারা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ৬-দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ এর জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল। নির্বাচনী বিজয় এতই চূড়ান্ত ছিল যে, আওয়ামী লীগ মোট শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছিল। এই বিজয়ের চূড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

স্বভাবতঃই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চূড়ান্ত রায় ছিল অতীতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে এবার ৬-দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হবে। তবে সিন্দু এবং পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ৬-দফা কে এড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই ৬-দফাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণের কাছে এই দলের জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ৬-দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ৬-দফার

আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর বিশ্বাসী ছিল। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী ৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আশা করা গিয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ আহবানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আলোচনায় বসবে। এমনই আলোচনার প্রস্তাব এবং পাঁচটা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামীলীগ সবসময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদে গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্ত্বর জাতীয় পরিষদ আহবানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্রের কাজে লেগে গেল এবং এ ধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সব আইনগত এবং বাস্তব দিক ও তারা পরীক্ষা করে দেখল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি'৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। এই বৈঠকের জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের ৬-দফা ভিত্তিক কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কি হতে পারে তাও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন। তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে, ৬-দফায় সাংঘাতিক আপত্তিজনক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি। তবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে একটি সমঝোতায় আসার উপর তিনি জোর দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি'৭১। জনাব ভুট্টো এবং তার দল আওয়ামী লীগের সাথে গঠনতন্ত্রের ওপর আলোচনার জন্য এ সময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন। ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি। বরং তিনি এবং তার দল ৬-দফার বাস্তব ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতি অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক, এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনো তৈরি বক্তব্য ছিল না, সেহেতু, এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপোস ফরফুয় আসাও সম্ভব ছিল না। অথচ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুরার সবসময়ই খোলা ছিল। এই আলোচনা বৈঠক থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন পর্যায় থেকে আপোস ফর্মুলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিল না।

এখানে একটি কথা আরও পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোনও আভাসও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ঢাকা থেকে আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গেলেন যে, আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসূ আলোচনায় বসবেন, অথবা জাতীয় পরিষদেও তারা ভিন্নভাবে আলোচনায় বসার জন্য অনেক সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে। তার এই সিদ্ধান্ত এ জন্যই সবাইকে আরও বেশি বিস্মিত করে যে, শেখ মুজিবের দাবি মোতাবেক ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথামতই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সমস্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। একাজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর লে. জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জনাব ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমরের চাপ সত্ত্বেও পি.পি.পি. ও কাইয়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতীত অপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিমানে পূর্ববাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন। এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, পি.পি.পি.র বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তার দোস্তু ভুট্টোকে খুশি করার জন্য। শুধু তাই নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলার গভর্নর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্নর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনে মধ্যপন্থি বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গালীদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি জাভার হাতে তুলে দেয়া হল।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে কোনক্রমেই ভুটোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণ-রায় বানচাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্যকরি করতে পারত এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারত। এটাকে বানচাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা 'টুটো জগন্নাথে' পরিণত করার.....।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছা ইয়াহিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এক পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলাদেশের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহিয়া নিজেই আহ্বান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা এক বাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন। শেখ মুজিব এতদসত্ত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩ মার্চ অসহযোগ কর্মসূচির আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনো তিনি আশা করেছিলেন যে, সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে। গত ২ ও ৩ মার্চ ঠাণ্ডা মাথায় সামরিক চক্র কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত কার্যকরী অসহযোগ আন্দোলন কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলছে দেশের সর্বত্র। নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোন বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ গণ-প্রশাসন বিভাগের কর্মচারীগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারীগণ তাদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকে তারা ক্ষান্ত হলেন না, অসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলবেন না।

এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামী লীগ বাধ্য হল। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশনাবলী সর্বান্তকরণে মাথা পেতে নিলেন এবং সমস্যাবলীর সমাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যাবলীর মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পাল্টালেন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রন্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে হল। কেননা তার ঐ দিনের প্ররোচনামূলক বেতার বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুটো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকার সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লে. জেনারেল ইয়াকুব খানের স্থলে পাঠানো হল লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতোমধ্যে মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪-দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেয়া হয় তার শেষ সুযোগ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপণ

করা। ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণ-হত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অনুরূপ একটি সফট সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল।

১ মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাঙ্কগুলো ফেরত আনা হয়। ১ মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানী কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরকেও কেউ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে। ১ মার্চের পর বাংলাদেশের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পি.আই.এর কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলাদেশে আনা হলো। সি ১৩০ পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলাদেশ স্তুপিকৃত করা হয়।

হিসাব নিয়ে জানা গেছে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরকে বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমগ্র বিমানবন্দর এলাকায় আটলারি ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এস. জি. কমান্ডো বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেয়া হয়। ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকান্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংঘটন করেছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য।

প্রতারণা বা ভন্ডামির এই স্ট্রাটেজি গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপোসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪-দফা শর্তের প্রতি সামরিক জাতির মনোভাব কি? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আপত্তি নেই। তিনি আশা করেন যে, ৪-দফা শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

আলোচনাকালে যে সব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি হলঃ

- ১। মার্শাল ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটা বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।
- ২। প্রদেশগুলিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।
- ৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।
- ৪। জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোনয়নের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬-দফা হল বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীলনক্সা। পক্ষান্তরে এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী এম.এন.এ.দের পৃথকভাবে বসে ৬-দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হল অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন। এক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম.এম. আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ আলোচনায় তিনি স্পষ্ট ভাবে এই কথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৬-দফা কার্যকরি করার প্রশ্নে দুর্লভ কোন সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় কোন শব্দ বসবে সে নিয়ে। ২৪ মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য

রদবদলসহ সংশোধনীগুলি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোনো বাধাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হয়, কোন পর্যায়ে আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি। অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাস ইঙ্গিতেও এমন কোন কথা বলেননি যে, তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না।

গণহত্যাকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্ছুরির আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ফাঁকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তাই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইয়াহিয়া ঘুণাঙ্করেও মুজিবকে এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসার দরকার ইয়াহিয়া যদি আভাসে ইঙ্গিতেও এ কথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করত না। কেননা এমন একটা সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বানচাল করতে দেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশি করার জন্যই করা হয়েছিল। এটা কোন সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে জনাব এম. এম. আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এই খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোন চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং জনাব এম. এম. মাহমুদ আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে ২৫ মার্চ করাটা চলে গেলেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনীর শহরে ‘পজিশন’ গ্রহণ করতে থাকে। মধ্যরাত্রি নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর পরিচালনা করা হয় গণ-হত্যার এক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোন চরমপত্র। অথবা মেশিনগান, আটলারি সুসজ্জিত ট্যাঙ্কসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ধ্বংসলীলা শুরু করে দিল তার আগে জারি করা হয়নি কোন কারফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লে. জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ জারি করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত হয় নরককুণ্ডে, প্রতিটি অলিগলি ও আনাচেকানাচে চলতে লাগল নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যে সব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় মেশিনগানের গুলিতে।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখে ও পুলিশ ও ই.পি.আর. বীরের মতো লড়ে গেল। কিন্তু দুর্বল নিরীহ মানুষ কোন প্রতিরোধ দিতে পারল না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে, সব বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদেরকে দিয়ে গেলেন বাঙ্গালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানানো হল এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধ্যজ্ঞ সংগঠনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পর বিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনায় কোন সঙ্গতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগকে বে-আইনি ঘোষণা করে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির অবাধ মত প্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারল না। তার বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল যে, ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং বাংলাদেশের মানুষকে নির্মূল করার জন্য জঙ্গি আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লভ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব-পরিকল্পিত গণ-হত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোনোমতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্র এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদার সৈনিকরা লঙ্ঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা এবং ব্যবহার করেছে শিকারি পশুর মত। তারা চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। এসব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া খান ও তার সঙ্গ-পাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হত তাহলে তারা একই দেশের মানুষের উপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারত না। এই নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকিস্তানের বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায় যা ইয়াহিয়া রচনা করেছেন বাঙ্গালির রক্ত দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়া মাটি নীতির মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হলো আমাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধ্বংস করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনদিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

ইতোমধ্যেই এ লক্ষ্য পথে সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে, তাদেরই বিদায়ী লাথি উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল। অসউইজের পর গণ-হত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উটপাখির নীতি অনুসরণ করেছেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে, এতদ্বারা তারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তাহলে তারা ভুল করেছেন। কেননা পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজজেও মোহমুক্ত।

তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশে আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙ্গালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত-পালিত করছেন। দুনিয়ার কোন জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থে আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সেজন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপের ওপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুর্লভ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতি সমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং আমাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোন বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোন শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না- আমরা আশা করি শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।

আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে, তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বে আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। "জয় বাংলা!"